প্রতিকারাত্মক মতবাদ
(Retributive Theory)

এই মতবাদকে সর্বাধিক প্রাচীন বলে মনে করা হয়। অপরাধের প্রতিকার হয় শাস্তির মধ্য দিয়ে। একজন ব্যক্তি অন্যের বা সমাজের যতখানি ক্ষতিসাধন করে ঠিক ততখানি ক্ষতি তার উপর আরোপ করা হলেই প্রকৃত শাস্তিদান করা হয়। তাই প্রাচীন যুগে শাস্তিদানের নীতিটি ছিল— 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত।' এই নীতির মধ্যে অবশ্য মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি প্রকট হয়েছে যার নাম প্রতিশোধ। কিন্তু আলোচ্য শাস্তিতত্ত্বে প্রতিশোধ গ্রহণকে শাস্তির উদ্দেশ্য বলা হয়নি। অপরাধের যথার্থ প্রতিকার তখনই হয় তখন সমাজ অপরাধীকে তার অপরাধের দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য করে।

যাঁরা এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন যে মানুষ তার নিজস্ব ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্য দায়িত্ব বহন করতে হবে। অপরাধের দায়িত্ব বহন করার মধ্য দিয়েই অপরাধী শাস্তিভোগ করে। 'চোখের বদলে চোখ' এই নীতির মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের আভাস মিললেও বাস্তবে এখানে অপরাধের দায়িত্বভার বহন করনোই মূল কথা।

প্রতিকারাত্মক মতবাদ মনে করে যে আমরা অপরাধীর উপর শাস্তি আরোপ করি না। অপরাধই যেন শাস্তিকে ডেকে নিয়ে আসে। শাস্তিদাতার ভূমিকা এখানে গৌণ। শাস্তিকে তাই অনেকে অপরাধীর অধিকার (right) বলেছেন। যে অধিকার তার প্রাপ্য তাকে তা প্রদান করাই উচিত। যে সমাজ অপরাধীকে শাস্তি দেয় সেই সমাজ

Scanned with CamScanner

অপরাধীর অর্জিত দাবি পূরণ করে। শাস্তি অপরাধীর প্রাপ্য— এই বোধই প্রতিকারাত্মক মতবাদের মূল ভিত্তি।

প্রতিকারাত্মক মতবাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল শাস্তিকে এখানে অপরাধের সমানুপাতিক বলে মনে করা হয়েছে। এই সমানুপাতের অর্থ হল শাস্তির মাত্রা কোন অপরাধের মাত্রার তুলনায় কম বা বেশি না হয়। এখানে যে গাণিতিক সমানুপাতের আভাস আছে শাস্তিদানের ক্ষেত্রে সেইরকম সমানুপাত অভিপ্রেত বলে মনে হয়। আসলে যাঁরা এইরকম সমানুপাতের কথা বলেন তাঁরা মনে করেন যে অপরাধই শাস্তিদানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। এই ধারণা সমর্থনযোগ্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে আমরা সমানুপাতিক শাস্তির অনেক ব্যতিক্রম দেখতে পাই। গুরুতর অপরাধেও মৃদু তিরস্কারের মধ্যে শাস্তিদান সমাপ্ত হয় যদি তা অপরাধীর প্রথম অপরাধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সতর্কবাণীকেই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি। অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করাকেই আমরা শ্রেয় বলে মনে করি। অপরাধ এই সমস্ত ক্ষেত্রে শাস্তিদানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। অপরাধ ও শাস্তির সমানুপাতের প্রশ্ন তাই এখানে অবান্তর।

উপরোক্ত অভিযোগ নিতান্ত অসার নয়। তত্ত্বগতভাবে একথা হয়তো সত্য যে অপরাধ শাস্তির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত, তবুও শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে যে নৈতিক সম্পর্ক আছে তা কখনও কখনও শিথিল হতে পারে। তখনই গুরুতর অপরাধে লঘুতর শাস্তিদানকে আমরা অনুমোদন করি। প্রতিকারাত্মক মতবাদ মনে করে যে অপরাধী তার অপরাধের জন্য দায়ী একথা সত্য হলেও সে কোন কোন ক্ষেত্রে তার অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নাও হতে পারে। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকতে পারে কিন্তু সেই সুপ্ত প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে পরিবেশের প্রভাবে। একথা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে অপরাধীকে তার অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি দেওয়া অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। অপরাধের দায়িত্ব অপরাধী ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলে শাস্তির পরিমাণও সেই পরিমাণে কম হওয়া উচিত। প্রতিকারবাদ এইভাবে কিছুটা নমনীয় আকার গ্রহণ করে। এই আকারকে 'লঘু প্রতিকারাত্মক মতবাদ' (Mollified form of Retributive Theory) বলা হয়।

প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্বকে যদি আমরা এইভাবে বুঝি তাহলে অপরাধের উত্তরে ক্ষমাপ্রদর্শন করা হয়তো অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আরও গভীর একটি প্রশ্ন ওঠে: আমরা কি এখনও বলতে পারি যে একমাত্র অপরাধই শাস্তিদানের পক্ষে একমাত্র যুক্তি? এইভাবে প্রতিকারাত্মক মতবাদ কি নিজেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে না?

প্রতিকারবাদী তাঁর সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করতে পারেন। যেমন (ক) তিনি বলতে পারেন যে একজন অপরাধী সমাজে যে অকল্যাণ সৃষ্টি করেন একমাত্র

Scanned with CamScanner

...র দ্বারাই তার মোচন হতে পারে। কিন্তু প্রতিকারবাদীর এই দাবি যুক্তিহীন। ...র সমাজের বুকে যে ক্ষত সৃষ্টি করে তার নিরাময় হয় না। একজন খুনী যখন ...মানুষকে হত্যা করে তখন মৃত ব্যক্তিকে কোনভাবেই তার প্রাণ ফিরিয়ে ...যায় না। এমন কি খুনিকে যদি তার অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি দেওয়া হয় ...ও নিহত ব্যক্তির যে অকল্যাণ সাধিত হয়েছে তার পূরণ হয় না। তাই শাস্তি ...রাধের ক্ষতিপূরণ করে— এই দাবী মিথ্যা।

(খ) প্রতিকারবাদের সমর্থনে বলা হয় যে শাস্তি অপরাধীর প্রাপ্য। শাস্তি লাভ ...যেন অপরাধীর অধিকার। এখানে অধিকারের প্রশ্নটি পরিহাসের উদ্রেক ...। বলা হয়েছে যে অধিকার মানুষ অর্জন করে এবং মানুষ নিজে যা অর্জন ...সে নিজেই তাকে বর্জন করতে পারে। একজন অপরাধী যদি তার স্বকৃত ...রের দ্বারা অর্জিত অধিকারকে ত্যাগ করে তাহলে সেখানে শাস্তি দানের প্রশ্ন ...না।

...তুও প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্ব শাস্তিদানের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে। শাস্তির ...রেই সমাজে কিছু কল্যাণ সাধিত হয়। শাস্তি অপরাধীর অপরাধজনিত গ্লানিকে ...য়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। শাস্তি ভোগের মাধ্যমে ...ধীর অন্তর গ্লানিমুক্ত হয় কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু ...রাত্মক মতবাদের এই ব্যাখ্যায় শাস্তিকে আর অপরাধের প্রতিকার ...ibution) বলে মনে হয় না। বরং তার মধ্যে যেন উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ...র পাওয়া যায়। প্রতিকারাত্মক মতবাদ শাস্তিকে অপরাধের সামাজিক প্রতিক্রিয়া ...মনে করে। প্রতিক্রিয়ার ফলে অপরাধজনিত ক্ষতিকে অপরাধীর কাছেই ফিরিয়ে ...য় হয়।

...তিকারাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রাচীন আপত্তি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ...র অনুসারে সমাজ থেকে অকল্যাণকে দূর করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। কিন্তু ...ণ সৃষ্টি করার জন্য যে দায়ী শাস্তি কি তার জন্য আরও অকল্যাণ সৃষ্টি করে ...শাস্তি অবশ্যই একটি সুখকর বা শুভ ঘটনা নয়। সুতরাং বলা যায় যে অপরাধী ...যেমন অকল্যাণ সৃষ্টি করে সেইরকম শাস্তিদাতার হাত দিয়েও সমপরিমাণ ...ণের সৃষ্টি হয়। এইভাবে একটি অশুভ ঘটনাকে রোধ করার জন্য যদি আর ...অশুভ ঘটনা ঘটানো হয় তাহলে সমাজের পরিমণ্ডল দ্বিগুণভাবে কলুষিত ...র পরিণামে শুভফল পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত নই। ...তুও আমরা যদি মানুষের লৌকিক নীতিবোধের কথা বিবেচনা করি তাহলে ...যে শাস্তিকে তারা অকল্যাণের প্রতিকার রূপেই দেখতে চায়। সাধারণ ...র এই স্বাভাবিক বিশ্বাসকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এই লৌকিক

Scanned with CamScanner

বিশ্বাসের নৈতিকতা বিচার করা প্রয়োজন। বিচার করলে দেখা যাবে
প্রতিকারাত্মক মতবাদ হয়তো নীতিগতভাবে অগ্রাহ্য করার যোগ্য নয়।

সাধারণের দৃষ্টিতে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অবশ্যই বিধেয়। এমন কি যদি
থেকে কোন কল্যাণ সাধিত নাও হয় তাহলেও শাস্তি দেওয়া উচিত। যদি
কিছুমাত্র কল্যাণের সূচনা করে তাহলেও শাস্তির যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষেত্রে
প্রাসঙ্গিক নয়। তবে শাস্তির স্বগতমূল্যকে প্রতিকারবাদীরা অস্বীকার করেন না
অপরাধীর উপর শাস্তি আরোপ করা স্বরূপত একটি কল্যাণকর কাজ। শাস্তি হয়তো
অন্য কোন কল্যাণের জনক নয়; তবুও যেখানে শাস্তি অপরাধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
সেখানে তার নিজস্ব মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

র‍্যাচেলস তাঁর The Elemen is of moral Philosoph নামক গ্রন্থে এই
প্রসঙ্গে একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তটি উপরোক্ত বক্তব্যকে
সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে—

র‍্যাচেলস একজন নাজী (Nazi) যুদ্ধাপরাধীর কথা কল্পনা করেছেন যে
নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে গোপনে দক্ষিণ আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে
ধরা যাক্ সেই ব্যক্তিটি বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার সেই সমাজের একজন আদর্শ
ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। র‍্যাচেলস আরও কল্পনা করেছেন যে ধরা যাক্ এই ব্যক্তির
অতীত ইতিহাস ক্রমশঃ জানাজানি হয়ে গেল। এর ফলে এখন তাকে শাস্তি দেওয়া
সম্ভব। কিন্তু তাকে শাস্তি দেওয়ার কি কোন উপযোগিতা থাকবে অথবা শাস্তির ফলে
এই অপরাধীর কি কোনরকম সংশোধন হবে? বরং আমাদের মনে হয় যে এক্ষেত্রে
শাস্তির যদি কোন উপযোগিতা থাকে তাহলে তার মূল্য অতি ক্ষীণ হতে বাধ্য।

তবুও অনেকে মনে করতে পারেন যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে শাস্তিদানের কোন
উপযোগিতা যদি নাই থাকে তাহলেও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ব্যক্তিটিকে শাস্তি
দেওয়া উচিত। শাস্তিদানের নিজস্ব মূল্য আছে এবং সেই মূল্যের স্বার্থেই অপরাধীকে
শাস্তি দেওয়া উচিত। শাস্তির মাধ্যমে যে প্রতিকার সাধিত হয় তা কখনই নৈতিক
মূল্যহীন নয়।

প্রতিকারার্থে যখন শাস্তিদান করা হয় তখন প্রতিকারেই শাস্তির সার্থকতা
আছে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ শাস্তির সার্থকতা প্রতিকারে, তার দ্বারা অন্য
কোন শুভফল উৎপন্ন হোক্ বা না হোক্। শাস্তির পরিণামে কারও কল্যাণ সাধিত
না হলেও শাস্তিদান সার্থক হতে পারে। এর বিপরীতমুখী একটি মতবাদ আছে
সেই মতে শাস্তি যে ফল উৎপন্ন করে তার মধ্যেই শাস্তির যৌক্তিকতাকে খোঁজা
উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উপযোগবাদী (utilitarian) দৃষ্টিভঙ্গী বলা হয়।
উপযোগবাদীর মতে কর্মের নৈতিক মূল্য তার দ্বারা উৎপন্ন কল্যাণ বা মঙ্গলের

Scanned with CamScanner

পর নির্ভর করে। শাস্তির ক্ষেত্রেও বলা যায় যে শাস্তিদানের ফলে যদি কল্যাণ য় তাহলেই শাস্তিকে সার্থক বলা যায়। উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শাস্তিকে ভাবে সমর্থন করা হয়। এর ফলে দুটি শাস্তিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে— তিরোধাত্মক মতবাদ (Preventive or Deterrent Theory) এবং শোধনাত্মক মতবাদ (Reformative Theory)।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো প্রতিশোধ নেওয়া। "কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরাধমূলক আচরণ করে তাহলে সেই আচরণের ফল তার কাছেই ফিরিয়ে দিতে হবে"[৪]। প্রতিশোধাত্মক মতবাদের বক্তব্য হলো, অপরাধী যে আচরণ বা কর্ম করছে সেই কর্মের অমঙ্গল পরিণতি অপরের পক্ষে যেমন ভালো নয়, তেমনি তার নিজের পক্ষেও ভালো নয় — একথা অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার অপরাধমূলক আচরণের ফলে অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে কষ্ট ভোগ করেছে, তাকেও অনুরূপ কষ্ট ভোগ করানো হলো তার প্রতি অনুরূপ আচরণ করে। **এই মতবাদে 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' এই নীতি সমর্থিত হয়েছে।** অপরাধী যদি কারো প্রাণনাশ করে, তবে অপরাধীরও প্রাণনাশ করা হবে। অর্থাৎ, **এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাণদন্ড সমর্থনযোগ্য।**

আদিম সমাজে এই মতবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে, 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' এই নীতি গৃহীত হয়নি এই যুক্তিতে যে, এই নীতিটি প্রতিহিংসার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অপরাধীর শাস্তি বিধান করা খ্রীষ্টীয় সমাজে নিন্দনীয়। কিন্তু ম্যাকেঞ্জী মনে করেন যে, এই তত্ত্বটিকে অনেকেই বুঝতে ভুল করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মে যে প্রতিহিংসার নিন্দা করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা চরিতার্থ করার বাসনা বা ইচ্ছা। কিন্তু রাষ্ট্রে ন্যায় বিচারের আদালতে বিচারক যখন অপরাধীকে শাস্তি বিধান করেন, তখন তিনি এ ধরনের বাসনা বা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে একাজ করেন না, করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বিষয়নিষ্ঠভাবে ও পক্ষপাতশূন্য হয়ে অপরাধীর শাস্তি বিধান করেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। বস্তুত, অপরাধীকে তার অপরাধমূলক আচরণের জন্য কোন সমাজ যদি শাস্তি দান করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সেই সমাজে যে এক ধরনের স্ব-বিরোধিতা দেখা দেয়, তা অস্বীকার করা যায় না। অপরাধী যখন সামাজিক তথা নৈতিক বিধিকে ক্ষুণ্ণ করে, তখন সমাজের এটাই দাবী যে, অপরাধীর শাস্তি হোক্, নৈতিক বিধির মর্যাদা রক্ষিত হোক্।

লিলি বলেছেন, এটা নয় যে, শাস্তির কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তিমূলক একটি উৎস রয়েছে; মানুষের সমাজে বসবাস করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকা অনিবার্য। সমাজ নামক সামাজিক সংগঠনটির কিছু নিয়ম আছে যা না থাকলে তা ভেঙ্গে পড়ে। এই নিয়মগুলি

৪. "....The aim of punishment is to allow a man's deed to return on his own head". *A Manual of Ethics*, J. S. Mackenzie.

Scanned with CamScanner

কেউ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি বিধান করা হয়। শাস্তি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। সমাজ যেহেতু আমাদের নৈতিক জীবনের স্বাভাবিক পটভূমি, সেহেতু সমাজ ভেঙ্গে পড়ুক এবং মানুষ আবার ঘৃণ্য; পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী অসামাজিক অবস্থায় ফিরে যাক্ — এটা নৈতিকভাবে কামনা করা যায় না। অনেকের মতে, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে নৈতিক নিয়মের মর্যাদা ও কতৃত্ব রক্ষা করার জন্য। শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে নৈতিক নিয়ম লঙিঘত হবে এবং এর ফলে নৈতিক নিয়মের কোন মহিমাই থাকবে না। লিলির মতে, নৈতিক নিয়মের মহিমা রক্ষা করা বড়ো কথা নয়। সমাজের নিয়ম লঙঘন করার জন্যই অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সামাজিক নিয়মকে নিয়ম বলা যায় না।

অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, শাস্তি হলো নেতিবাচক পুরস্কার। কান্টের মতানুসারে, অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত, কারণ সে যে অন্যায় কাজ করেছে তা সে নিজের অথবা পরের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য করেনি। নৈতিক বিধিকে লঙঘন করলে শাস্তি পেতেই হবে। কান্টের মতে, শাস্তি বিধান হলো অবশ্য পালনীয় কাজ, অর্থাৎ কর্তব্য। হেগেল কান্টের মতোই বলেছেন যে, অপরাধী অপরাধ করেছে। তাই সে শাস্তি পাবার যোগ্য। ব্রাড্‌লি মনে করেন যে, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে, কারণ সে শাস্তি চেয়েছে। শাস্তি দান হলো সুবিচার। লিলির মতানুসারে, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের বিচার করা সকল নীতিবিদেরই উচিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রায় সার্বিকভাবেই এটা মনে করা হয় যে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই প্রতিশোধ নেওয়াটা নৈতিকভাবে মন্দ। কোন সংগঠিত জনসমষ্টি বা সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে এটা অনুমতি দিতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি আইন নিজের হাতে নিক্।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ মূলত দুটি রূপ বা আকার নিতে পারে, যথা, কঠোর এবং কোমল। কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীর অপরাধের গুরুত্বের ভিত্তিতে তাকে শাস্তি দিতে হবে। অপরাধ গুরুতর হলে শাস্তিও কঠোর হওয়া উচিত। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া চলবে না। লঘু অপরাধের দণ্ড লঘুই হওয়া উচিত। কিন্তু কোমল প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত কেবলমাত্র অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে নয়; অপরাধী যে-মানসিক অবস্থায় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অপরাধ করেছে সেই অবস্থার কথা ভেবে অপরাধীর শাস্তিবিধান করতে হবে। কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ যে গ্রহণীর হতে পারেনা, এটা সহজেই বোঝা যায়। তবে, কোন কোন নীতিবিজ্ঞানী কোমল বা লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদকে সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করে থাকেন। কারণ তাঁদের মতে, মানুষের ন্যায়বোধের ওপর লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদের ভিত্তি।

Scanned with CamScanner

Ethical Principles : P 313)"।

(৩) **শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory of Punishment) ঃ** শাস্তি সম্পর্কিত তৃতীয় তথা প্রতিশোধাত্মক মতবাদটির মূল সূত্র হল—"অপরাধীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা"। ফলত, এর লক্ষ্যই হল—"দাঁতের বদলে দাঁত (Teeth for a teeth)" এবং "চোখের বদলে চোখ (eye for an eye)"। অর্থাৎ, এরূপ মতবাদে অপরাধীকে তার অপরাধ কর্মের ফল অনিবার্যভাবেই ভোগ করতে হয়। কারণ তাকে বুঝতে হবে যে, যার উপর অপরাধ ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে; শুধু তার কাছেই তা অমঙ্গলের নয়, নিজের কাছেও তা সমপরিমাণে অমঙ্গলের। এক্ষেত্রে অত্যাচারিত ব্যক্তি যে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, অত্যাচারীকেও অনুরূপভাবে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া উচিত। অধ্যাপক লিলি (Lillie) তাই বলেন—"শাস্তির উদ্দেশ্য হল যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, সে যেমন কষ্ট পেয়েছে; তেমনি কষ্ট অপরাধী নিজেকেও পেতে হবে (The aim of Punishment is to make the offender suffer what his victim has suffered. W. Lillie, ***An Introduction to Ethics*** : P 254)"।

Scanned with CamScanner

প্রতিশোধাত্মক মতবাদে এই দাবীই করা হয় যে, যেহেতু স্বেচ্ছাধীন ও নিজের জ্ঞাতসারে অপরাধী তার অপরাধ ক্রিয়া সমাজের অন্য কোন দুর্বল মানুষের উপর সম্পন্ন করেছে, সেহেতু তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ অন্যথা যেন না হয়। রাষ্ট্র বা সমাজ হল সেই সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে সক্ষম। সুতরাং রাষ্ট্র বা সমাজই স্থির করবে অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ কতটা, এবং সেই অনুপাতে তার শাস্তির পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত। অপরাধী তার অপরাধমূলক ক্রিয়ার দ্বারা দুটি নিয়মের লঙ্ঘন ঘটায়—(১) সামাজিক নিয়মের লঙ্ঘন, এবং (২) নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘন। শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাই এই দুটি নিয়মের মর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিশোধাত্মক মতবাদের স্বপক্ষে সওয়াল করে অধ্যাপক সেথ্ (Seth) তাই বলেন—"শাস্তি সত্তার অর্থ হল নৈতিক নিয়মের শুদ্ধকরণ যার মধ্যে নিন্দনীয় ভাবে ফাটল সৃষ্টি করে অপরাধ (Punishment in its essence, a rectification of the moral order of which crime is the notorious breach.—Seth, ***A study of Ethical Principles*** : P 315)"।

অন্যায় আচরণকারীকে যে শাস্তি পেতেই হবে—প্রতিশোধাত্মক মতবাদে সেই সত্যটি প্রাথমিক ভাবেই স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাই বলেন—"শাস্তির মৌল উদ্দেশ্য হল অপরাধীর কৃতকর্মের বোঝা তারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে বুঝতে দেওয়া যে, তার কৃতকর্মের জন্য শুধু অন্যেরই অকল্যাণ হয় নি, নিজেরও অকল্যাণ হয়েছে (The aim of Punishment is to allow a man's deed to return on his head, i.e. to make it appear that the evil consequences of his act are not merely evils of others, but evils in which he is himself involved. ***A Manual of Ethics*** : J. S. Mackenzie, P 325)"। সুতরাং অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে, এবং শাস্তি দেওয়াটাই হল সমাজের নৈতিক কর্ম। সমাজের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সমীচিন।

মানুষের আদিমতম সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হতেই এই প্রতিশোধাত্মক মতবাদের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন যুগে আদিম মানুষ অপরাধ করার জন্য অপরাধীকে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করত। সেক্ষেত্রে দয়া, মায়া এবং করুণা প্রভৃতির কোন স্থানই ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে প্রখ্যাত চিন্তানায়ক অ্যারিস্টটল (Aristotle) বলেন যে, সমাজে ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল প্রশংসিতও যেমন হতে পারে, তেমনি আবার তা নিন্দনীয় হতে পারে। তাঁর মতে, অপরাধীর কাজ অবশ্যই নিন্দনীয়। অপরাধী তার কৃতকর্মের জন্য যে পুরস্কার লাভ করে তাই হল শাস্তি। এ জন্যই অ্যারিস্টটল শাস্তিকে এক প্রকারের নঞর্থক পুরস্কার (Negative reward) রূপে অভিহিত করেছেন। এই নঞর্থক পুরস্কারটিও যথোপযুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশোধাত্মক স্পৃহাই ব্যক্ত হয়েছে।

শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিশোধাত্মক মতবাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন যে, এরূপ মতবাদ খৃষ্টধর্মের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ, খৃষ্টধর্মে প্রতিশোধ স্পৃহা ও বিদ্বেষের ভাবকে কখনোই সমর্থন করা হয় না। কিন্তু ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) মনে করেন

Scanned with CamScanner

যে, এরূপ ধারণাটি খৃষ্টধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টধর্মে ততক্ষণই হিংসার মনোবৃত্তিকে নিন্দনীয়রূপে স্বীকার করা হয়েছে, যতক্ষণ তা ব্যক্তিগত হিংসাকে চরিতার্থ করার উপায়রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে শাস্তিদান প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত হিংসা চরিতার্থতার বিষয়টি অবশ্যই অমূলক। এরূপ শাস্তির সমর্থনে লিলি (Lillie) ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হল—"লামেক কেইন্‌কে সাতবার আঘাত করলে কেইন্ লামেককে অবশ্যই আরো সত্তরবার বেশী আঘাত করবে (If Cain shall be averged seven fold, Tru Lamech seventy and seven fold.—W. Lillie, ***An Introduction to Ethics*** : P 254)। এরূপ উক্তি থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত অর্থে প্রতিশোধাত্মক নীতিটি খৃষ্টধর্মের অনুশাসনের মধ্যেও স্পষ্ট।

আধুনিককালে, প্রতিশোধাত্মক মতবাদের পৃষ্ঠপোষক রূপে উল্লেখ করা যায় প্রখ্যাত চিন্তানায়ক কান্ট এবং ব্রাডলির নাম। কান্ট মনে করেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যারা অপরাধ কর্মে লিপ্ত তাদের যথাযথ শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত এজন্যই যে, ভবিষ্যতে আর কোন অপরাধ ক্রিয়া সংঘটিত হবে না। তিনি অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে একটা সুষম সামঞ্জস্য কামনা করেন। ব্রাডলির (Bradley) মতে শাস্তি হল তাই—যা ব্যক্তির নিজের আচার-আচরণের জন্য লাভ করে। অর্থাৎ, সমাজে মন্দ আচরণ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। কারণ অপরাধী সমাজস্থ নৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে। আর সেই লঙ্ঘিত নৈতিক নিয়মের পুর্নবাসনের জন্য অপরাধীর শাসতি অবশ্যই কাম্য। আর তা না হলে, মানুষকে ফিরে যেতে হবে হবস্ (Hobbes) বর্ণিত ঘৃণ্য ও বর্বর সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে নৈতিকতার অপমৃত্যু ঘটেছে জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। অধ্যাপক লিলিকে (Lillie) অনুসরণ করে তাই আমরা বলতে পারি—"সুসংবদ্ধ সমাজে জীবনযাপনের জন্য যে সমস্ত নিয়মকানুন আবশ্যক, সেগুলিকে যারা অমান্য করতে চায়, তাদের শাস্তিও আবশ্যক (If the laws are necessary condition of our life in organised societies, then there must be some penalty for disobeying them. W. Lillie, ***An Introduction to Ethics,*** P-255)।"

শাস্তি সম্পর্কিত প্রতিশোধাত্মক মতবাদের ক্ষেত্রে দুটি রূপের কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। এই দুটি রূপ হল—যথাক্রমে; (১) **কঠোর প্রতিশোধাত্মক রূপ (Rigoristic form of Retributive Theory),** এবং (২) **লঘু প্রতিশোধাত্মক রূপ (Mollified form of Retributive Theory)**। প্রথম মতবাদ তথা কঠোর প্রতিশোধাত্মক রূপের পরিপ্রেক্ষিতে দাবী করা হয় যে, শাস্তি প্রদানের সময় বিচারককে অপরাধের গুরুত্ব বুঝে অপরাধীকে কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাধীর বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, শরীর স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থা কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করা চলবে না। এর জন্যে যদি গুরুতর কোন দণ্ড দেওয়া হয়, বা এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়, তাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। অপরাধের পরিমাণ যা হবে, শাস্তির পরিমাণও তাই হওয়া উচিত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মতবাদ তথা লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দাবী করা হয় যে, অপরাধীকে যথোপোযুক্তভাবে শাস্তি প্রদান করতে হবে ঠিকই, কিন্তু শাস্তি

Scanned with CamScanner

প্রদান করার সময় বিচারককে অপরাধীর বয়স, লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, শরীর স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থা প্রভৃতি সব কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে হবে। এ সবকিছু বিচার বিবেচনা করার পরেই অপরাধীর শাস্তির মাত্রা স্থির করা উচিত। তাতে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, বা বিচারকরা সঙ্গত বলে মনে করেন; তাহলে অপরাধীকে গুরুদণ্ডের পরিবর্তে লঘু দণ্ডই দিতে হবে। অবশ্য এমনটি তখনই হওয়া উচিত যখনই অপরাধী পরিস্থিতির শিকারে অপরাধ কর্ম সংঘটিত করে। এরূপ বিচার বিবেচনার ভার বিচারকের উপরেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বিচারকের রায় যাই হোক না কেন, তা অপরাধীকে মান্য করতেই হবে। বিচারক যদি কোন প্রকার গুরুদণ্ড প্রদান করেন, অথবা এমনকি মৃত্যু দণ্ডেও দণ্ডিত করেন, তাহলেও সেই রায়কে ফলপ্রসূ করা উচিত। এক্ষেত্রে কোনরূপ দয়া দাক্ষিণ্য বা অন্য কোন প্রকার আনুকূল্য প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয় নয়। অপরাধীকে যে দণ্ডই দেওয়া হোক্ না কেন, তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Retributive Theory) : এরূপ মতবাদের ক্ষেত্রেও যে কিছু দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ দিক বিদ্যমান—তা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

প্রথমত, প্রতিশোধাত্মক মতবাদের মূল ত্রুটি হল যে, এরূপ মতবাদ প্রতিশোধ স্পৃহার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এরূপ তত্ত্বে "চোখের বদলে চোখ (eye for an eye)", দাঁতের বদলে দাঁত (Tooth for tooth)" প্রভৃতি নীতিকে স্বীকার করে নেওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঢিলটি মারলে পাঁটকেলটি খেতে হবে। এক্ষেত্রে তাই কোন প্রকার সমঝোতা পরিদৃশ্য নয়। সুতরাং প্রতিশোধ স্পৃহাই এক্ষেত্রে মুখ্য রূপে গণ্য। আর প্রতিশোধ স্পৃহাই যেক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে আর যাইহোক্ না কেন, ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ সম্ভব নয়। এ কারণেই এরূপ মতবাদটি সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অপরাধকে তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিবিধানের কথা বলা হয়েছে এই মতবাদে। কিন্তু অপরাধকে মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অপরাধ তাই মানবজীবনেরই অঙ্গ বিশেষ। মানুষের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে তা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এমন কোন মানুষই পর্যবেক্ষিত হবে না—যার মধ্যে কোন না কোন অপরাধ প্রবণতা নেই। সুতরাং অপরাধ করলেই যদি শাস্তি প্রদানের নিয়মটিকে সমর্থন করা হয়, তাহলে সমগ্র মানব সমাজ একটি বৃহত্তম কয়েদে পরিণত হবে। কিন্তু তা আদৌ কাম্য নয়।

তৃতীয়ত, এরূপ মতবাদের প্রবক্তারা 'অপরাধ' এবং 'শাস্তি'র মধ্যে একপ্রকার তুল্যমূল্য সমতার দাবী করে, বিচারশীল মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। কারণ, অপরাধ এবং শাস্তি কোন জড় বস্তু নয় যে তাদের তুল্যমূল্য সমতা ওজন করা সম্ভব। তাছাড়াও বলা যায় যে, এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নেই বলে, এই দুয়ের মধ্যে তুল্যমূল্য সমতা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার রূপে পরিগণিত।

চতুর্থত, আধুনিক কালে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দাবী করা হয় যে, প্রতিশোধাত্মক মতবাদ হল মানবতা বিরোধী। কারণ, এরূপ মতবাদে মানবতাবাদের কোন

Scanned with CamScanner

স্থানই নেই। এখানে শুধু চিন্তা করা হয় অপরাধীর অপরাধ এবং তার প্রাপ্য শাস্তি। এর বাইরে আর অন্য কোন কিছু চিন্তা করা হয় না। অথচ একজন মানুষকে শুধু অপরাধী হিসাবে বিচার না করে, মানুষ হিসাবেই বিচার করা উচিত। কিন্তু এই মতবাদে এরূপ চিন্তাভাবনার কোন প্রকাশ নেই বলে, তা সকলের কাছে গ্রহণীয় নয়।

পঞ্চমত, প্রতিশোধাত্মক মতবাদে দাবী করা হয়েছে যে, অপরাধী স্বজ্ঞানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নৈতিক নিয়মের লঙঘন ঘটায় বলে, সমাজের নৈতিক নিয়মের পূর্ণস্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা বিধেয়। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করতে সাহায্য করে যে, অপরাধীর সমস্ত প্রকার অপরাধই স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বজ্ঞানে সম্পাদিত নয়। কোন কোন অপরাধ অবশ্যই পরিস্থিতির চাপে সম্পাদিত। আবার দেখা যায় যে, এরূপ ভাবে অপরাধ সংঘটিত হবার পর, তথাকথিত অপরাধীদের অনেকেই অনুতাপের দাবানলে অহরহ দগ্ধ হয়। সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ভোগ করতে থাকে। এরূপ অবস্থা তার জীবন্ত মৃত্যুরই সামিল। সুতরাং তাকে আর নূতন করে শাস্তি দেওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে?

ষষ্ঠত, শাস্তি সম্পর্কিত কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদে অপরাধীর বয়স, লিঙ্গ, পেশা, মানসিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার পরিবেশের উপর কোন গুরুত্বই প্রদান করে না। কিন্তু আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদানের কথা স্বীকৃত হয়েছে। কারণ, এই সমস্ত বিচার বিশ্লেষণের ফলেই অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কিত বিশদ তথ্য পাওয়া সম্ভব, এবং তারপরই তাকে সাজা দেওয়া সঙ্গত, তার পূর্বে নয়। শাস্তির ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ এগুলির কথা চিন্তা না করায় আধুনিক কালে অত্যন্ত কঠোর ভাবে সমালোচিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner